কংগ্রেসী সরকারের স্বৈরাচারী ও চণ্ডনীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

পাটনার ঘটনা এক কলঙ্কময় ইতিহাস রচনা করেছে

পাটনার ছাত্রদের কেন্দ্র করে যে ঘটনা প্রবাহ গোটা বিহার প্রদেশে কিছুদিনের জন্য তীব্র ঝড় তুলেছে তা সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দল, নামজাদা নেতাদের এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের সমস্ত দৃষ্টি যখন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল পর্ত্তুগীজ অধ্যুষিত গোয়ার দিকে—তখন ঘরের পাশে এই নৃসংশ হত্যাকাণ্ডের খবর অনেকের দৃষ্টিই এড়িয়ে গেছে। ১৫ই আগষ্ট গোয়ায় নিরস্ত্র ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের ওপর পর্ত্তুগীজ সরকার যখন গুলীবর্ষণ করে ভারতের "পণ্ডিত" প্রধানমন্ত্রী নেহরু তখন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"নিরস্ত্র জনতার ওপর কোন সভ্যদেশের সরকারেরই গুলীবর্ষণ করার অধিকার আছে কিনা মানবতার নামে এই প্রশ্নের জবাব আমি পেতে চাই—আন্তর্জ্জাতিক আইন এ প্রসঙ্গে কি বলে সে দিকে বিভিন্ন রাষ্ট্র নায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।"

পণ্ডিতজীর এই ঘোষণার সাথে প্রায় ঐ একই সময়ে পাটনায় নিরস্ত্র ছাত্র ও জনতার ওপর বিহারের কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ নির্ব্বিচারে উপর্য্যুপরী তিনদিন ১১, ১২ ও ১৩ই আগষ্ট বেপরোয়া গুলী চালায়।

গত ১০ই আগষ্ট পাটনা কলেজের ছাত্রদের সাথে বাস কণ্ডাক্টারদের একটি গোলযোগকে কেন্দ্র করে কোন সরকার ছাত্র ও সাধারণ মানুষের ওপর যে এই ধরণের অত্যাচার চালাতে পারে তা কল্পনার অতীত। আগাগোড়া ঘটনার বিশ্লেষণ যে কোন নিরপেক্ষ এবং সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তির মনে সরকারী স্বৈরাচারী ও পুলিসী বর্ব্বরতা এবং মানুষের জীবনের প্রতি কংগ্রেসী নেতাদের চূড়ান্ত অবহেলার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করতে বাধ্য। ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মহলের মতে মনে হয় যে বিহারের পুলিস কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ওপর যে কোন অজুহাতে প্রতিশোধ স্পৃহা মেটাবার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। ১০ই আগষ্টের সামান্য ঘটনা যেন সেই অপূর্ব্ব সুযোগই এনে দিল। তা না হলে এই ধরণের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কি প্রয়োজন থাকতে পারে বি এন কলেজের সামনে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা মোতায়েন করার আর তার পরের দিন ১১ই আগষ্ট নিরস্ত্র এবং অতি স্বাভাবিক ছাত্র শোভাযাত্রার ওপর বেপরোয়াভাবে গুলী চালনার। এই অত্যাচার অতি স্বাভাবিক কারণেই পাটনার সমস্ত ছাত্র সমাজ এবং জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১১, ১২, ও ১৩ই আগষ্ট তিন দিন উপর্য্যুপরি পাটনা ছাত্র ও জনতার ওপর কংগ্রেসী পুলিশ যে বর্ব্বর ও অমানুষিক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায় তা পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোন যুগে যে কোন দেশে অনুষ্ঠিত পৈশাচিক বর্ব্বরতার ইতিহাসকে ম্লান করে দেয়। পুলিশী বর্ব্বরতার কাহিনী যদিও সম্পূর্ণভাবে আজও প্রকাশিত হয়নি তথাপি বিহারে সেই সময়কার যে কোন দৈনিক পত্রিকার বিবরণ পাঠ করলেই স্তম্ভিত হতে হয়। একমাত্র বি. এন কলেজের ভবনের গাত্র থেকে তদন্তকারী বিচারপতি ৬২ টি বুলেট উদ্ধার করেছেন। এ ছাড়া আরোও বহু বুলেট আশে পাশে বিভিন্ন দোকানে, গাছ ও লাইট পোষ্ট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

এই গুলীকাণ্ডের প্রতিবাদে ১১ তারিখ থেকে পাটনা সহরে ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, দোকানদার, রিক্সাচালক, শ্রমিক তথা সমস্ত স্তরের মানুষই আন্দোলন শুরু করে। পাটনা শহরে সমস্ত দোকান পাট, বাজার প্রভৃতি পূর্ণ হরতাল এবং স্কুল কলেজে সফল ধর্ম্মঘট বেশ কয়দিন ধরেই চলতে থাকে। নিহতের সংখ্যা সরকারীভাবে যাই হোক আসলে যে সে সংখ্যা অনেক বেশী তা বোঝা যায় কিছু কিছু মৃতদেহ শেষ পর্য্যন্ত গঙ্গার জলে ফেলে দেবার প্রামান্য সংবাদ থেকে। পাটনার এই স্ফুলিঙ্গ অতিদ্রুত বিহারের বিভিন্ন জেলাকে প্রজ্বলিতকরে। ১৪ই আগষ্ট পাটনার অর্দ্ধ লক্ষাধিক ছাত্র ও জনতার সভায় স্থির করা হয় যে ১৫ই আগষ্টের "স্বাধীনতা দিবস" সমগ্র বিহারে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে "প্রতিবাদ ও শোক দিবস" হিসেবে পালন করা হবে। এই সভায় (১) ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত (২) বিহার পুলিশের আই জি এবং পাটনার শাসন কর্ত্তার অপসারণ ও শাস্তি। (৩) পুলিশী অত্যাচার বন্ধ করা প্রভৃতি দাবী গৃহীত হয়। ১৫ই আগষ্ট সমগ্র বিহারে—রাজধানী পাটনা হতে দূরাঞ্চলে সহর ও গ্রামগুলোতে পর্য্যন্ত "স্বাধীনতা" দিবস জাতীয় শোক দিবসে পর্য্যবসিত হয়। উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য বিহারের সমগ্র অঞ্চলে শহরে ও গ্রামে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, কর্মচারী ও শ্রমিক—সমগ্র জনতা একযোগে কংগ্রেসী বর্ব্বরতার তীব্র প্রতিবাদ করে। তেরাঙ্গা ঝাণ্ডার পরিবর্ত্তে সমগ্র বিহারে কালো ঝাণ্ডা প্রদর্শিত হয়—বিক্ষুব্ধ জনতা রাজভবন, সরকারী ভবন, কোর্ট, রেল ষ্টেশন প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তেরাঙ্গা ঝাণ্ডা সরিয়ে দিয়ে কালো ঝাণ্ডা উত্তোলিত করে। মনে পরে যায় '৪২ সালের আন্দোলনের দিনগুলির কথা যেদিন ঠিক এমনি ভাবেই জনতা সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক 'ইউনিয়ন জ্যাক' সরিয়ে দিয়ে সেদিনকার জাতীয় আকাঙ্খার প্রতীক তেরাঙ্গা ঝাণ্ডা উত্তোলিত করে। জনতার সেই আকাঙ্খার প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করায় আজ তার এই অবস্থা।

পাটনায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৫ই আগষ্টে রাঁচী, গয়া, আরা, দ্বারভাঙ্গা, চম্পারণ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, ছাপরা প্রভৃতি সমস্ত জেলাতেই ছাত্র সমাজ ও জনতা একযোগে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে ও সর্ব্বত্র

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বন্যার্ত্তদের সাহায্য করুন

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জি উড়িষ্যার বন্যাপ্রপীড়িত জনসাধারণের সাহায্যকল্পে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

উড়িষ্যার বন্যায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ৬০ হাজার বর্গ মাইল স্থান বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে এবং ৩০ লক্ষ অধিবাসী গৃহহীন হইয়াছে। এই সমস্ত অধিবাসীদের সাহায্যকল্পে এস, ইউ, সির পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ইউনিট ১৯শে হইতে ২৫শে সেপ্টেম্বর সপ্তাহব্যাপী এই তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করিবে। জনসাধারণের প্রতিটি স্তরের মানুষকে এই আবেদনে যথাযথভাবে সাড়া দিতে এবং মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতে আবেদন করিতেছি। সংগৃহীত অর্থ "সর্ব্বহারা ফ্লাড রিলিফ কমিটির" (উড়িয়া বাজার, কটক—১) নিকট প্রেরণ করা হইবে।

বন্যার্ত্তদের পরিত্রানের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম লিখাইবার জন্য আবেদন করিতেছি। এই ব্যাপারে ৪৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সমাজ

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র

৮ম বর্ষ, ঃ ২য় সংখ্যা] ২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার '৫৫ [চার পয়সা

নেতৃত্বের দুর্ব্বলতায় আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিরোধী সভা, শোভাযাত্রা, কালো পতাকা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে পুলিশী বর্ব্বরতার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। উল্লেখযোগ্য এই যে সর্ব্বত্র সমস্ত স্তরের মানুষ একই সাথে (কোন কেন্দ্রীয় আহ্বান ব্যতিরেকেই) বিহারে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পরিচালিত কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করে। বিহারের সমস্ত জেলার এবং সদর আদালতের উকিল এবং মোক্তারদের "বার এসোসিয়শন" গুলি বিভিন্ন সভায় কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করে। ছাত্রদের ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মঘটের চাপে বিহার বিশ্ববিদ্যালয় ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত স্কুল কলেজ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়। রাঁচীতে দশ হাজারের ছাত্র শোভাযাত্রা রাজভবনের সরকারী উৎসব বন্ধের দাবীতে এবং জাতীয় পতাকার পরিবর্ত্তে কালো পতাকা উত্তোলনের চেষ্টায় রাজ্যপালের নিকট উপস্থিত হলে পুলিশ নির্দয় ও বেপরোয়া লাঠি চালনায় শতাধিক ছাত্রকে গুরুতরভাবে আহত করে এবং তারপর দুই তিন দিন রাঁচীতে পুলিশী তাণ্ডব অব্যাহত থাকে। গয়া জেলার নওয়াদাতে ১৫ হাজার জনতার জমায়েতের ওপরে ১৫ই আগষ্ট পুলিশ গুলীবর্ষণ করে এবং ঘটনাস্থলে ৪ ব্যক্তি নিহত হয়। গয়া জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সহ বহু ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং কংগ্রেস কমিটি এই গুলীচালনার প্রতিবাদ করে। ঠিক এই ধরণেরই ঘটনা উত্তর বিহারের জেলাগুলীতেও ঘটে; চম্পারণ দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের প্রভৃতি জেলায় আন্দোলন '৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনকেও ছাপিয়ে যায়। সরকারী মহল পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে এই সমস্ত জেলাগুলিতে চারটি থানা জনতা দখল করে ও আগুন লাগায়, পাঁচটি রেজিষ্টারের অফিস ধ্বংস হয় এবং অনেকগুলি কোর্টের কাগজপত্রও জনতা পুড়িয়ে দেয়। উত্তর বিহারের কয়েকটি স্থানের ট্রেণ চলাচল জনতা কর্ত্তৃক ব্যাহত হয়। ষ্টেট্‌সম্যানের মত পত্রিকা পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে বিহারের আন্দোলন '৪২ সের আন্দোলনদের রূপ ধারন করেছে। ১৫ তারিখের পর থেকে সমস্ত মফঃস্বলের সহর ও গ্রাম থেকে প্রত্যহ পাঁচ—সাত হাজার ছাত্র দূর দূরাঞ্চল থেকে শোভাযাত্রা করে এসে পাটনা শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। পাটনায় ছাত্রদের পাশাপাশি বাহাদুরের মত এগিয়ে আসে রিক্সা চালকেরা। রিক্সা চালকেরা মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে এবং আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ১৫ তারিখের প্রদেশ ব্যাপী বিক্ষোভের রূপ দেখে প্রাদেশিক সরকার ভীত হয়ে পুলিশী বর্ব্বরতা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ১৬ তারিখ থেকে সর্ব্বত্র পুলিশ প্রহরা প্রকাশ্য স্থান থেকে অপসারিত হয়। পুলিশী ও সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে এক ত্রাসের সঞ্চার হয়। পাটনায় কংগ্রেস ব্যতীত সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন পুলিশী কার্য্যের তীব্র নিন্দা করে এবং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও পুলিশী অত্যাচারের নিরপেক্ষ বিচারের দাবী করে। আন্দোলনের চাপে প্রাদেশিক কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রীসভা ১১, ১২, ১৩ তারিখের ঘটনার তদন্তের জন্য Judicial Enquiry Committeeর দাবী মেনে নেয়। ১৪৪ ধারা পাটনা সহর থেকে সরকারীভাবে প্রত্যাহার না করলেও ছাত্র জনতা এই সরকারী আদেশের চূড়ান্ত অবহেলা করে প্রত্যহই হাজারে হাজারে বিরাট সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান করে। পাটনা ছাত্র অ্যাক্‌সন কমিটি তাদের কয়েক দফা দাবী নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে নেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। আন্দোলন যে সমস্ত স্তরের জনতার মধ্যেই কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে তা কয়েকটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। বিহারের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গণ-সংগঠন এবং সমস্ত "বার এসোসিয়েশন" এবং বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী (ভাইসচ্যান্সেলার সহ) এবং বিশিষ্ট আইনজীবীরা মন্ত্রীসভার পদত্যাগের দাবীতে দৃঢ় সঙ্কল্প থাকেন। Judicial Enquiryতে বিহারের সহস্ত আইনজীবী এমনকি পাটনার এডভোকেট জেনারেল পর্য্যন্ত বিহার সরকারের পক্ষ সমর্থন করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্য্যন্ত বিহার সরকারকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মরনাপন্ন হতে হয় এবং ডাঃ বিধান রায় পশ্চিম বঙ্গের ষ্ট্যাডিং কাউন্সিলের শঙ্কর ব্যানার্জীকে এই কাজের জন্য প্রেরণ করে।

পাটনা এবং বিহারের এই গণ-আন্দোলন আমাদের দেশের চলতি রাজনৈতিক আবহাওয়ার দিকে নজর রেখে বিশ্লেষণ করলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আশ্চর্য্যপূর্ণ বলে মনে হয়। বিগত কিছুকাল ধরে পণ্ডিতজীর রাজনীতি বিশেষ করে বিদেশে তাঁর মর্য্যাদা বৃদ্ধি এবং ভারতের কোন কোন রাজনৈতিক মহলের বিনা সর্ত্তে সমর্থনে অনেকের মনেই দেশে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি এবং সরকারের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে বলে ধারণা জন্মেছে। কেহ কেহ যেন প্রায় স্থির সিদ্ধান্তেই এসে পড়েছেন যে কংগ্রেস সম্বন্ধে জনতার মোহ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে বিদেশে পণ্ডিতজী যত সম্মানলাভই করুন না কেন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জনতার জীবনে মৌলিক সমস্যার সমাধানে তাঁর সরকার যে কিছুই করতে পারে নি এদিকে অনেকেই নজর রাখতে ভুল করেন। দৈনন্দিন জীবনের অভাব, অনটন, লাঞ্ছনার ফলে জনতার মনের গভীরে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ যে সমপরিমাণেই আছে এবং যে ঘটনা প্রবাহে ও সুযোগে সেই মনোভাব বাস্তবে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং কোথাও কোথাও তীব্র আন্দোলনের রূপ নেয় এই বাস্তব সত্যের প্রতি অন্ধ থাকা যায় না। এই আন্দোলন বিহারের সর্ব্বস্তরের জনতার মনের কংগ্রেস বিরোধীতারই নিদর্শন।

পাটনার এবং বিহারের ছাত্র-সমাজকে আমাদের শুধু অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোই ন... তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি অভিনন্দন জানানোও কর্ত্তব্য। শহীদ দীননাথ পাণ্ডে ও অন্যান্য শহীদদের প্রতি আমাদের 'সেলাম' জানিয়ে আমরা এই আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আলোচনা করতে চাই। বিপ্লবী হিসেবে একটা গণ-আন্দোলনে যা ঘটেছে তাতেই সন্তুষ্ট না থেকে আন্দোলনকে আরোও ব্যাপক, তীব্র ও প্রসারিত করার কথাও আমাদের ভাবতে হয়। যদিও ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ইতিহাসে এই ধরণের আংশিক আন্দোলনের নজীর অনেক আছে এবং প্রতিবারই প্রত্যেকটি আন্দোলেনেই বেশ কিছু দুর্ব্বলতা নজরে পড়ে তাই আজকেও সেই একই ধরণের ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। প্রথমেই মনে হয় যে এতবড় একটা আন্দোলন ঘটে গেল যেন অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই। যেখানে আন্দোলন প্রতিদিনই প্রসারলাভ করছিল এবং সর্ব্বস্তরের জনতার সমর্থন এর পেছনে ছিল তখন আন্দোলনের সামনে সুনির্দ্দিষ্ট কর্মপন্থার অভাব অত্যন্ত নগ্নভাবেই ধরা পড়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারা যায় না যে ১৫ তারিখের পর যখন হাজার হাজার ছাত্র পাটনায় প্রতিদিন আসছিল তখন তাদের সামনে কোন কর্মপন্থাই ছিলনা। শুধু তাই নয়—আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কোন পরিকল্পনা বা নেতৃত্বের অভাবও স্পষ্ট দেখা যায়। অবিশ্যি সংগঠনের অভাবই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। রাজনৈতিক দলগুলোর কথা ছেড়ে দিলেও ছাত্রদের মধ্যে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রদেশব্যাপী এক সুসংহত সংগঠন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা গড়ে ওঠেনি। এই জন্যই এই আন্দোলন যত ব্যাপকই হোক না কেন স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে একটা কার্য্যকরী আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়েছে। হয়তো বা ক্ষমতাধীন দলের মধ্যেও এই আন্দোলনের সুযোগে বিরাট ফাটল ধরিয়ে দেওয়া যেতো।

প্রসঙ্গক্রমে পি, এস, পি, এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। পি, এস, পি'র আদর্শগত দেউলিয়া পনার কথা ছেড়ে দিলেও আভ্যন্তরীণ সংগঠনের ক্ষেত্রে দলটি যে কি ধরণের স্থিতাবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং নেতা ও দলের পরস্পর বিরোধী কার্য্যাবলীর মারফৎ। এই দলের বিহার বিধান সভার নেতা মহামায়া প্রসাদ যখন আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন এবং যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছেন তখন দলের বাকী অংশ এর বিরোধিতা করে এবং ভিন্নপথ অবলম্বন করে। কম্যুনিষ্ট পার্টি যদিও বিহারে তেমন শক্তিশালী নয় তথাপি অনেকটা যেন পণ্ডিতজী ও কংগ্রেসের কৃপায় তাহারা অনেকখানি প্রাধান্যলাভ করেছে। এদের বর্ত্তমান রাজনীতি কারুরই অজানা নয়। কম্যুনিষ্ট পার্টির শেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেস সরকারের শুধু বৈদেশিক নীতিতেই প্রগতিবাদের ধাপ আছে তাই নয় সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতিতেও "প্রগতিবাদের লক্ষণ বিদ্যমান।" তাই এরা বর্ত্তমানে সাচ্চা ও প্রগতিবাদী "কংগ্রেসীদের সাথে যুক্ত ফ্রন্ট করতে ইচ্ছুক। পার্টির এই জঘন্য নীতিরই নিতান্ত যান্ত্রিক প্রয়োগ দেখা গেল বিহারের এই আন্দোলনে। ১৪ তারিখে সমস্ত জনতা যখন সরকারে বিরুদ্ধে প্রচণ্ড

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

'জাতীয় পতাকা'র দোহাই—উগ্র জাতীয়তাবাদের আড়ালে শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার অপচেষ্টা মাত্র

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মারমুখী তখন পাটনার অর্দ্ধলক্ষাধিক ছাত্র সভায় কম্যুনিষ্ট পার্টির জনৈক প্রাদেশিক নেতা গদগদভাবে ঘোষণা করলেন "ইমানদার" (সৎ) কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের কোন লড়াই নেই। মনে হ'ল যেন তাদের যত আক্রোশ ব্যক্তিগত-ভাবে দুইজন সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে। জাতীয় পতাকার" অবমাননার অজুহাতে যখন সরকারী মহল আন্দোলনের সমালোচনা করছিল কম্যুনিষ্ট পার্টির বিহার প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট তখন ঘোষণা করলো যে তারা জাতীয় মর্য্যাদা ও রাষ্ট্রীয় পতাকার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং এই জন্যই নাকি ১৫ তারিখে কালো পতাকা প্রদর্শনের তারা বিরোধী ছিলেন।

শুধু তাই নয়—কোথাও যেন আন্দোলন বিপ্লবমুখী না হয় তার জন্য এই দল সচেষ্ট ছিল। তাই পণ্ডিতজীর বক্তৃতার সমালোচনা করতে গিয়ে প্রচণ্ড কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষী জয়প্রকাশও "কম্যুনিষ্ট পার্টি অত্যন্ত সংযত আচরণ করিয়াছে" বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এই সংযত আচরণের আসল অর্থ জনতার পক্ষে বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

সর্ব্বশেষে বিহারের আন্দোলন উপলক্ষ্যে ভারতের "দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত" মহামান্য নেহরুজীর পাটনায় গত ৩০ তারিখের বক্তৃতা আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। এই আন্দোলনের সময়ে সোস্যালিষ্ট জয়প্রকাশ নেহরুকে পাটনা আসার আমন্ত্রণ জানান। কম্যুনিষ্ট পার্টিও ঘোষণা করে যে 'ইমানদার' পণ্ডিতজীর পুলিশী বর্ব্বরতা স্বচক্ষে দেখা উচিত। আর কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তাদের সর্ব্ব কীর্ত্তির সাফাই গাওয়ার জন্য তো পণ্ডিতজীর মুখের দিকে তাকিয়েই আছেন। তাই পণ্ডিতজীর পাটনায় আগমন! নেহেরুজীর ঐ দিনকার ভাষণে একটা কথাই পরিষ্কার বোঝা গেল তিনি শুধু তাঁর নিজের বহু বিঘোষিত গণতন্ত্রের আদর্শই ভোলেন নি, মস্তিষ্কের সুস্থতাও তিনি অনেকখানি হারিয়েছিলেন। সরকারী ফাইলের বাঁধা রিপোর্টে তিনি নিজের অভিমত তৈরী করেছেন এবং যে কোন ভাবেই স্বীয় দলীয় সরকারের সমস্ত কুকীর্ত্তিকে চাপা দেবার কর্ত্তব্যই প্রধান বলে গ্রহণ করেছেন।

নেহরু মহা স্বৈরাচারী এবং ফ্যাসিষ্ট কায়দায় শুধু একটি কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, রাষ্ট্রীয় পতাকার অমর্য্যাদা তিনি বরদাস্ত করবেন না এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে লক্ষ লক্ষ জনতার মৃত্যুকেও পরোয়া করেন না। আমরা প্রথমেই শুধু একটি কথার অবতারণা করতে চাই। পাটনায় পুলিশ গুলী চালিয়েছে ১১, ১২, ১৩ই আগষ্ট আর জাতীয় পতাকার তথাকথিত 'অমর্য্যাদা' হয়েছে ১৫ তারিখে বা তার পরে। এই ক্ষেত্রে গুলী চালনার কি সাফাই নেহরুজী গাইতে পারেন? তিনি নিজেই এ ব্যাপারে নীরব। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই তথাকথিত মর্য্যাদা অমর্য্যাদার প্রশ্ন। যদিও এ প্রসঙ্গে আমরা পাটনা ছাত্র অ্যাক্সন্ কমিটির সাথে একমত যে আসল প্রশ্ন এড়াবার জন্য বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এবং পণ্ডিতজী রাষ্ট্রীয় পতাকার মর্য্যাদার ধূয়া তুলেছেন। তথাপি এর তত্ত্বগত দিকটিও আলোচনা করতে চাই। রাষ্ট্রীয় পতাকায় মর্য্যাদা বা জাতীয় সম্মান প্রভৃতি কথাগুলির কোন নির্বিশেষ সত্তা নেই; জাতীয় সম্মান নিশ্চয়ই দেশ যাদের নিয়ে গঠিত সেই অগণিত জনগণের স্বার্থকে পদদলিত করে উঁচু রাখা যায়না। তেমনি রাষ্ট্রীয় পতাকায় মর্য্যাদা জনগণের বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না। যে পতাকা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে দেখা দেয় এবং জনতার জীবনের মূল প্রশ্নের সমাধানের সংগ্রামে প্রেরণা জোগায় সেই পতাকার শুধু সম্মান রক্ষাই নয় তার জন্য হাজারে হাজারে জীবন বিসর্জন করতেও জনতা পিছপা হয়নি—হবেওনা। সেই পতাকার মর্য্যাদা মানেই জনতার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা।

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ইউ, সি, আর, সি-কে দলীয় প্রচার কার্য্যের সংকীর্ণতা হইতে উর্দ্ধে রাখুন

গত ২৭শে থেকে ২৯শে আগষ্ট বেলঘরিয়ায় সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের (ইউ, সি, আর, সি) তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে আগষ্ট সকালে বিভিন্ন অংশের উদ্বাস্তুদের খণ্ড সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সুপারীশক্রমে মূল সম্মেলনে প্রেরীত হয়। কিছু কিছু সংশোধন করে প্রস্তাবগুলি সম্মেলনে গৃহীত হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে, পারিপার্শ্বিক প্রমানপত্রের (circumstantial evidence) পরিবর্ত্তে এফিডেফিট, এম, এল, এ, এম পি বা গেজেটেড অফিসার এবং বাস্তুহারা সংগঠনের সার্টিফিকেটকে বাস্তুহারা প্রমানপত্র হিসাবে গণ্য করিতে হইবে, ভাড়াটীয়া বাড়ীর উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দান, জমি ক্রয় করিয়া পুনর্ব্বাসনের প্রচেষ্টাকারী উদ্বাস্তুদের সমস্ত হয়রানীর অবসান, পশ্চিম বঙ্গে জমি থাকা পর্য্যন্ত বাংলার বাইরে প্রেরণ বন্ধ করা, সর্ব্বপ্রকার উচ্ছেদ প্রচেষ্টা বন্ধ করা, টেনামেণ্ট স্কীম বাতিল করা, সমস্ত জবরদখল কলোনীগুলিকে আইন সিদ্ধ করা; সমস্ত প্লট হোল্ডারদের অর্পণ পত্র দান ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য রাজ্যস্তরে সর্ব্বদলীয় উপদেষ্টা বোর্ড এবং অন্যান্য স্তরে সমস্ত গণসংঠনের প্রতিনিধি লইয়া স্থানীয় পুনর্ব্বাসন কমিটী গঠনের পূর্ব্বতন দাবীও এই সম্মেলনে গৃহীত হয়।

উপরোক্ত দাবীগুলি আদায় করার জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। কম্যুনিষ্ট পার্টি ইউ, সি, আর সি'র মধ্যে সংখ্যাগুরু, শক্তি সুতরাং এ সম্পর্কে দায়িত্বও তাহাদেরই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার প্রচেষ্টার পরিবর্ত্তে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে কমিউনিষ্ট পার্টি যেভাবে ইউ সি আর-সিকে ব্যাবহার করছে সেই সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ কর্ম্মী ও উদ্বাস্তু সাধারণের গভীর ভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে।

সম্মেলনে উদ্বোধন করেন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীজ্যোতি বসু। একটা সম্মেলনের কার্য্যক্রম স্থির করার সাথে সাথে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও উদ্বোধকের নাম স্থির করবে কার্য্যকরী সমিতি—এটাই রীতি। কিন্তু এই সম্মেলনে দেখা গেল কার্য্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই শ্রীজ্যোতি বসুকে দিয়ে উদ্বোধন করান হল। ইউ-সি-আর-সির মত গণ-সংগঠনে—যেখানে পার্টিগত ভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি সংখ্যাধিক্য সেখানে সংখ্যাল্প (Minority) অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এবং বিশেষ ভাবে অদলীয় উদ্বাস্তু সংগঠকেরা যদি মনে করেন যে, সংখ্যাধিক্যের জোরে কমিউনিষ্ট পার্টি তার দলীয় রাজনিতির প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন এই সংগঠনে,তবে তাঁরা কি অন্যায় করবেন? প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটেছেও তাই। গোটা সম্মেলনে একটা নোংরা দলীয় আবহাওয়া রয়ে গেছে।

সম্মেলনে আগত অধিকাংশ প্রতিনিধিরা কমিউনিষ্ট পার্টির অতি পরিচিত কর্মী। কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি, যারা যারা বিভিন্ন প্রস্তাবে কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে একমত হতে পারেন নি তারা তাদের বক্তব্য সম্মেলনের সামনে উপস্থিত করার প্রতিটি প্রচেষ্টার সাথে সাথেই গোটা মণ্ডপে একটা হট্টগোল সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন ফল পাওয়া যায় নি। এমন কি প্রবীন জননেতা শ্রীজীবন লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমাপ্রসাদ রায় রায় চৌধুরী, শ্রীরামকৃষ্ণ মজুমদার প্রমুখ বাস্তুহারা নেতৃবৃন্দকেও এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

প্রস্তাব রচনার ব্যাপারে প্রতিটি গণ-সংগঠনেই সমস্ত প্রস্তাব—যাদের মত বৈষম্যের অবকাশ রয়েছে—রাজনৈতিক মতাদর্শ অবলম্বনেই পরিচালক মণ্ডলি পূর্বাহ্নেই আলোচনা করে রাজনৈতিক মতামতের ঐক্য সাধন করার চেষ্টা করেন। ইউ-সি-আর-সি এতদিন এই পদ্ধতিতেই চলছিল। কিন্তু এই বৎসরে যেহেতু কমিউনিষ্ট পার্টি সংখ্যাধিক্য—তাই রাজনৈতিক বিরোধী চিন্তাধারা সম্পন্ন প্রস্তাব পরস্পর আলোচনা না করেই উত্থাপিত ও ভোটের জোরে গৃহীত

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ব্যাপক ও সংহত গণআন্দোলনের আঘাতে কংগ্রেসী রাজের অবসান ঘটান

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু যে পতাকা (সে শুধু কাপড়ের টুকরো বলেই নয়) বা যে রাষ্ট্রীয় চিহ্ন স্বৈরাচারী, নিরঙ্কুশ, কায়েমী স্বার্থের প্রতীক হয়ে পড়ে তার প্রতি জনতা স্বভাবতঃই আকর্ষণ রাখেনা। যে পতাকা উড়িয়ে স্বৈরাচারী রাজ দেশবাসীর ওপর বর্ব্বর অত্যাচার চালায় সেই পতাকার মর্য্যাদা রক্ষার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। আর কেনা জানে যে জমিদার, জোতদার, মিলমালিকের স্বার্থ ও আদর্শ মূলগত ভাবে শোষিত মানুষের স্বার্থ ও আদর্শের বিরোধী এবং একথাও ঠিক যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে শ্রেণীর হাতেই থাকুক না কেন সেই শ্রেণীর আদর্শকেই রাষ্ট্রীয় পতাকা বহন করে। তাই বর্তমান শোষক গোষ্ঠী যাঁরা জনতাকে শোষণ করেই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তাদের পতাকা শোষিত শ্রেণীর আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত তো করেই না বরঞ্চ তার বিরোধীতাই করে চলে। অথচ এ সত্ত্বেও শুনে আশ্চর্য্য হতে হয় যখন দেখি বামপন্থী এমন কি সাম্যবাদী বলে পরিচিত দলগুলোও নেহরুর সাথে একইভাবে তেরাঙ্গা ঝাণ্ডার পক্ষে ওকালতি করছেন! কম্যুনিষ্ট পার্টি সহ এই সমস্ত বামপন্থী দলগুলো গোয়ার ব্যাপারে জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা রক্ষার মহান (!) ব্রতে উঠে পড়ে লেগেছেন। জনতার সামনে এদের মুখোস খুলে ধরতে হবে।

পরিশেষে পণ্ডিতজীর বক্তৃতার বিষয় এবং ঢংকেও লক্ষ্য করা দরকার। তার সমস্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এক জাতীয়তাবাদী তথা ফ্যাসিষ্ট সুর ফুটে উঠেছে। নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলী চালনা বা এতগুলি লোকের প্রাণ বিসর্জনের জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র অনুতাপ তো ফুটে ওঠেই নি বরঞ্চ এক প্রচণ্ড দম্ভ স্বৈরাচারী ও হিটলারী রূপ প্রকাশ পেয়েছে। ১১, ১২, ১৩ তারিখের হত্যাকাণ্ডের সাথে জাতীয় পতাকার তথাকথিত অপমানের কোন যোগাযোগ না থাকলেও অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে পতাকার ব্যাপার তুলে ধরেছেন দুটো কারণে—একটি আন্দোলনকে স্তিমিত করা ও জনতার দৃষ্টিকে অন্যদিকে মোড় ফেরান দ্বিতীয়টি হচ্ছে এর সাথে সাথে জাতীয় পতাকার নাম করে জনসাধারণের মনে উগ্র জাতীয়তাবাদের জঞ্জালকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা। অবশ্য বিহারের ছাত্ররা বিনা প্রতিবাদে নেহেরুজীকে ছেড়ে দেয় নি; সেদিনকার সভায় প্রায় ২০ হাজারের মত ছাত্র কালো পতাকা ও দাবী সম্বলিত পোষ্টার হাতে নিয়ে নেহেরুর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছে।

এই সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা দরকার যে পাটনা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যতদিন জনতা তথা শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত না হচ্ছে যতদিন আদর্শগত প্রভাব থেকে জনতাকে মুক্ত করা না যায় ততদিন এই নিরঙ্কুশ অত্যাচারেরও শেষ হবে না। তাই পাটনার এই ঘটনা থেকে এশিক্ষাই নিতে হবে যে এখনও জনতার মনে পুঞ্জীভূত আক্রোশ জমে আছে এবং তাকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে ও সংগঠিত করতে পারলে এক বিরাট বৈপ্লবিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে। ভবিষ্যতের আন্দোলনে এই শিক্ষা কাজে লাগাতে পারলে আগামীদিনের আন্দোলনে সফলতাই আসবে বিফলতা নয়।

ইউ,সি,আর,সিকে দলের ঊর্দ্ধে রাখুন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শান্তির প্রস্তাবটি উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের নিকট কয়েকবার প্রস্তাবটি দেখতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই উত্তর পাওয়া গেছে সময়ের অভাবে প্রস্তাবটি রচনা করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু পরে জানা গেছে যে উত্থাপনের বহু পূর্বেই শান্তির প্রস্তাবটি রচিত হয়েছে অথচ পূর্বে প্রস্তাবটি দেখতে না দেবার কারণ কি? যখন উত্থাপিত হল তখন দেখা গেল প্রস্তাবটি বিতর্কমূলক এবং কোন কোন রাজনৈতিক দলের দলীয় চিন্তাধারার প্রভাব সম্পন্ন। প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ব মুহূর্তে এই প্রস্তাবের বিতর্কমূলক অংশটি সম্পর্কে প্রস্তাবের রচয়িতা শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায় এবং কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোন ফল হয় নি। বাধ্য হয়ে শ্রীরমাপ্রসাদ রায় চৌধুরী সমস্ত বিতর্কের ঊর্দ্ধে শান্তির উপর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রথমে রমাপ্রসাদ রায় চৌধুরীর প্রস্তাবটি উত্থাপন না করে, বিকল্প প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও, মূল প্রস্তাবের উপরে ভোট চাওয়া হয়। কিন্তু বারংবার প্রতিবাদ করার ফলে বাধ্য হয়ে প্রস্তাবটিকে আলোচনা করতে দেওয়া হয়। প্রথমত হট্টগোল করে এবং পরবর্ত্তী কালে সময়ের অভাবের অজুহাতে বিকল্প প্রস্তাবটিকে সম্পূর্ণ ভাবে আলোচনা করতে দেওয়া হলো না। সর্বশেষে যা হবার তাই হলো অর্থাৎ শ্রীজীবন লাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাব কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থনে ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। ভোটের জোরে প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে, কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যে কংগ্রেসী সরকারের বৈদেশিক নীতি প্রকৃত শান্তি নীতি নয়, তবে, কংগ্রেসী সরকারের বৈদেশিক নীতির জয়ঢাক যারা যত খুসী বাজাতে পারেন কিন্তু গণ-সংগঠনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিজেদের মত অন্যকেও ভোটের জোরে জয়ঢাক পেটাবার চেষ্টা করার অর্থ গণ-গংগঠনের সংহতি বিনষ্ট করা, এই মূল কথাটি এই সমস্ত দলের কর্মীদের স্থির ভাবে চিন্তা করতে অনুরোধ করি। প্রসঙ্গত 'গণ-বিপ্লবে' প্রকাশিত এই সম্পর্কে সম্মেলনের রিপোর্টের একটি অংশ অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। উক্ত পত্রিকার নিজস্ব 'সংবাদদাতা'কে আবার সম্মেলনের সংবাদগুলিকে স্মরণ করবার জন্য অনুরোধ জানাই। সংবাদের অংশটিতে বলা হয়েছে, "তাসত্ত্বেও রমাপ্রসাদবাবু চান এই নেহেরু সরকারের সশস্ত্র ক্ষমতা প্রয়োগে গোয়ার মুক্তি সাধন।" গোয়া সম্পর্কে রমাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও তার দল এস-ইউ-সির বিশ্লেষণ সর্বজন বিদিত। উক্ত সংবাদদাতা কি স্মরণ করবেন যে তথাকথিত সময়ের অভাবে গোয়া সম্পর্কে কোন আলোচনার সুযোগই রমাপ্রসাদ বাবু পান নি? সে সত্ত্বেও গোয়া প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ বাবুর বক্তব্য হিসাবে যা বলা হয়েছে তা কি ভ্রান্তিবশতঃ না শান্তি প্রস্তাব ও নেহেরু সরকারের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে রমাপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বিশ্লেষনকে বিকৃত করার জন্য?

সাধারণ পরিষদ এবং কার্য্যকরী সমিতির নির্ব্বাচনেও যে সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতে বহু নেতৃস্থানীয় সংগঠক বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাদের বলতে শোনা গেছে কমিউনিষ্ট পার্টি যদি তাদের নীতি পরিবর্ত্তন না করেন তবে ইউ-সি-আর সি কে রাজনৈতিক দল বিশেষের প্রচার প্লাটফর্মে রূপায়িত করার মাধ্যমে বাস্তহারা আন্দোলনের ব্যাপকতা নষ্ট করা হবে। কমিউনিষ্টপার্টির সাধারণ কর্মীদের ও উদ্বাস্তু সাধারণের এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে।

কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক আর, সি, জি, সি ইউনিয়নের ম্যাণ্ডামাসের দাবী গৃহীত

গত ২রা সেপ্টেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ডি, এন, সিনহা—রয়েল ক্যালকাটা গলফ্ ক্লাব মজদুর ইউনিয়ন কর্তৃক ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ম্যাণ্ডামাসের আবেদন গ্রহণ করিয়া পশ্চিমবাংলার শ্রম দপ্তরের জয়েণ্ট সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী, লেবার কমিশনার, সহকারী লেবার কমিশনার ও আর-সি-জি-সির সেক্রেটারীর উপর এক রুল জারী করিয়াছেন।

স্মরণ থাকিতে পারে যে মজদুর ইউনিংনের—ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্বহাল ও মাইনা বৃদ্ধির দাবীগুলি আলাপ আলোচনা মারফৎ মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে ইউনিয়নের তরফ হতে ট্রাইব্যুনালের দাবী করা হয়। সরকারী শ্রমদপ্তর হইতে এই দাবী না মঞ্জুর হওয়ায় মজদুর ইউনিয়ন ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে ম্যাণ্ডামাসের আবেদন হাইকোর্টে করে ও হাইকোর্ট কর্তৃক ইহা গৃহীত হয়।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল হোসিয়ারী মজদুর ইউনিয়ন গঠিত

পশ্চিম বাংলার হোসিয়ারী শ্রমিকদের এক সাধারণ সভায়—বেতন বৃদ্ধি, চাকুরীর স্থায়িত্ব, ওভার টাইমের ডবল মজুরী, ছাঁটাই বন্ধ, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ছুটী, বোনাস ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রভৃতির দাবীতে "ওয়েষ্ট বেঙ্গল হোসিয়ারী মজদুর ইউনিয়ন" নামে পশ্চিম বাংলায় একটি সংগ্রামী সংগঠন গঠন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড নীহার মুখার্জি।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক ২৩ নং ডিহ্রসন লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।